

Creative Journal

Volume-04, Issue-1
Year of Publication: August 2026
Plot 6, Avenue 6, Sector 17/H-1
Uttara Residential Model Town,
Dhaka 1230.
Email: editor_journal@smuct.ac.bd



শামশাদ চৌধুরী, পিএইচ.ডি
সহযোগী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব ফ্যাশন ডিজাইন
অ্যান্ড টেকনোলজি
এসএমইউসিটি
Cell: 01715069005
E-mail: sonali_0808@yahoo.com

এম এন আই চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক
ডিপার্টমেন্ট অব ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড
টেকনোলজি, এসএমইউসিটি
Cell: 01711198514
E-mail: 01nazrul@gmail.com

বাংলাদেশের পোড়ামাটির পুতুল, দেব-দেবীর মূর্তি: ঐতিহাসিক ও নান্দনিক বিশ্লেষণ

শামশাদ চৌধুরী
এম এন আই চৌধুরী

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হল মৃৎশিল্প, যার শেকড় গাঁথা রয়েছে সিন্ধু সভ্যতার ঐতিহ্যে। পোড়ামাটি, পাথর, হার ও অন্যান্য ব্যবহার্য বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে নানা ধরনের পুতুল, খেলনা ও ছোট ছোট দেব-দেবীর মূর্তি সামাজিকভাবে বহুল-ব্যবহৃত। তবে আদিকালে এই মূর্তি বানানো বা পুতুল বানানোর প্রথা চালু হয় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিশ্বাস বা জাদু বিশ্বাস থেকে। জাদু বিশ্বাস ধর্ম না হলেও ধর্মের পূর্ব শরিয়ত বলা যেতে পারে এবং পরবর্তীকালে এই জাদু-বিশ্বাস ধর্মীয়-বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। তবে শুধু ধর্ম বিশ্বাস নয়, সামাজিক ব্যবহারেও এসব বহুল আলোচিত পুতুল, খেলনা ও ছোট ছোট দেব-দেবীর মূর্তি আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরম্পরায় চলে আসছে। ভারত, পাকিস্তান ও অবিভক্ত বাংলা ও অন্যান্য অংশ নিয়ে গঠিত ভারতীয় উপমহাদেশের এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এসব পুতুল, খেলনা, দেব-দেবীর ছোট মূর্তি সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই তৈরি হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক ও সিন্ধু সভ্যতার কালে এর সঙ্গে আরো অঞ্চল যুক্ত ছিল। তাই এসকল জায়গাতে প্রায় একই ধরনের শিল্পরীতি দেখতে পাওয়া যায়। লোকজ শিল্পের সাথে ধর্মীয় চিন্তার বিকাশে মাটির তৈরি দেব-দেবতার মূর্তি, পুতুল ও খেলনা তৈরি আদিমকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনচর্চা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটেছে এই মাটির শিল্পকর্মে।

মূল শব্দ: ছোট আকৃতির দেব-দেবতার মূর্তি, মৃৎশিল্প, প্রাগৈতিহাসিক।

গবেষণায় চন্দ্রকেতু গড়, পাণ্ডু রাজার ডিবি এবং মহাস্থানগড়ের মতো প্রত্নতত্ত্ব স্থল থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন-এর ভিত্তিতে দেখা গেছে যে, এই পুতুলগুলো কেবল শিশুদের খেলনা ছিল না বরং অনেক ক্ষেত্রে তা ছিল উর্বরতার বা ধর্মীয় প্রতীক। তবে কবে কখন কিভাবে মাটির পুতুল তৈরি হয়েছে সেটা জানা না গেলেও নদীমাতৃক এ দেশের মৃৎশিল্পীরা সহজলভ্য ও উপযুক্ত মাটি ব্যবহার করেই পুতুল শিল্পের সূচনা করেন। পুতুল শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পুরুষ বা নারীর প্রতিমূর্তি হচ্ছে পুতুল, তবে বাংলার পুতুল বলতেই মাটির পুতুল প্রাধান্য পায়। সিন্ধু সভ্যতায় অবিকৃত পোড়ামাটির খেলনা, বিশেষ করে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির খেলনার সাথে এই অঞ্চলের খেলনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই খেলনাগুলো তিন থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। আবার বিশেষ ক্ষেত্রে ১ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়।

“ল্যাটিন শব্দ pupa (doll) থেকে puppet শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ বাংলায় পুতুল। এটি সুস্পষ্ট অঙ্গবিশিষ্ট যাকে বাহ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বেশিরভাগ পুতুল খেলনা বা দেবদেবীর ছোট আকৃতির মূর্তি মানুষ বা জীবজন্তুর আদলে করা হয়ে থাকে, বাস্তব জড় বস্তুর প্রতিবিন্দ। সাধারণত ক্ষুদ্র আয়তন মূর্তিকেই আমরা পুতুল বলে থাকি বা এর বিপরীতে পুতুলকেও মূর্তি বলে থাকে” (PK Acharya: ১৯৪৬, ৪২৬)।

আজ থেকে প্রায় ৩৫ হাজার বছর আগে মানব ইতিহাসের সূচনা কাল থেকে, মানুষ যখন গুহাবাসী ও শিকারি তখন থেকেই সে চিন্তার ভাস্কর্যের চর্চা করে। কারণ, মানুষ জন্ম থেকেই একজন শিল্পী। প্রাচীন যুগে মানুষের হাতে সৃষ্ট শিল্পকর্মের অন্যতম নিদর্শন অজন্তা ইলোরার চিত্র ও ভাস্কর্য। প্রায় দুই হাজার বছর আগে একদল সন্ন্যাসী দুর্ভেদ্য অরণ্য আচ্ছাদিত বিপদ সংকুল এই অন্ধকার গুহাঘাটায় বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি আঁকতে গিয়ে মানব জীবনের আনন্দ বেদনা প্রেম বিরহ প্রাণী প্রকৃতির প্রতি অনুরাগে যে অপরিচিত ভাস্কর্যের নিদর্শন রচনা করেছেন, তার সমতুল্য কিছুই বিশ্বশিল্পের ইতিহাসে নেই। দেবতা শিবের নিত্যতা রূপ নটরাজ মূর্তি দেখে আধুনিক ভাস্কর্যের অন্যতম রূপকার আউগুস্ত রদ্যা বলেছিলেন, এর চেয়েও শ্রেষ্ঠতর ভাস্কর্য এখনো পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নাই (দ্র. আবুল মনসুর, ২০১৭: ১১)।

বাংলায় পুতুল তৈরির গুরু বহু বছর আগে। প্রাচীনকালে যে পুতুল তৈরি হতো তার সামাজিক নানা বিবর্তনের সাথে তাল রেখে যুগে যুগে পুতুল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ৫ হাজার বছরের পুরনো বা তার চেয়েও প্রাচীন পোড়ামাটির (Terracotta) পুতুল বা নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। মূলত সিন্ধু সভ্যতা ও তার সমসাময়িক মেহেরগড় বা তাম্রলিপ্ত (তমলুক) অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে মাটির তৈরি মা-দেবী বা পুতুল পাওয়া গেছে, যা হাজার হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। এগুলি মূলত মেহেরগড় (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-২৫০০) বা সিন্ধু সভ্যতার যুগের (প্রায় ৫০০০ বছর বা তার বেশি পুরনো) বলে ধারণা করা হয়। এই পুতুলগুলো হাতে তৈরি, ছাঁচে তৈরি নয়। এগুলোকে লোকায়ত বাংলার প্রাচীন শিল্প নিদর্শন ধরা হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশের বিভিন্ন মেলায় পাওয়া টেপা পুতুল বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুতুল রূপ বলে পরিচিত। (<https://www.google.com/> ৩ এপ্রিল ২০২৬)। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে মূর্তিগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে ‘ভেনাস অফ উইলেন ড্রফ’ খুব ছোট আকৃতির মাতৃকা মূর্তি। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে এটি এখন পর্যন্ত স্বীকৃত। এর সমপর্যায়ের মূর্তি হিসাবে আমাদের এই অঞ্চলে মাতৃকা মূর্তি বা মাদারগডেস নামে পরিচিত মূর্তিগুলোর কথা বলতে পারি, যা উর্বর শক্তি হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে দেখা যায়। নারী পুতুলগুলো উর্বরতার শক্তির প্রতীক।

বর্তমানে পৌরাণিক, অলৌকিক দেব-দেবীকে পুতুল হিসেবে দেখা হয়। পুতুল বা মূর্তি যখন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা হয়ে যাচ্ছে দেব-দেবতা। কারণ আদিমকালে ভয়-ভীতি দূর কিংবা শত্রু তাড়ানোর জন্য পুতুল তৈরি হলেও সময়ের বিবর্তনে পুতুল হয়ে উঠেছে শিল্প যা এখন মানুষকে বেঁচে থাকার সাধ-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে থাকে। হিন্দুমূর্তি হচ্ছে দেবতা বা মর্ত্যের প্রতিমা বা বিগ্রহের জন্য সাধারণ শব্দ। এটি প্রতীক এবং মোটিফ আচার উপাসনায় পূজিত হয় (Joyce, ২০১৫: ৭৭)। হিন্দুধর্মে ‘মূর্তি’ হলো ঈশ্বরের কোনো নিরাকার ধারণার সাকার রূপায়ণ, মূর্ত প্রতীক বা প্রকাশ। এটি সরাসরি কোনো ঈশ্বর নয়, বরং ভক্তদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও আরাধনায় মনোযোগ নিবদ্ধ করার একটি মাধ্যম (উইকিপিডিয়া, ২০২৪)।

এই গবেষণাপত্রটি বাংলার পোড়ামাটির ক্ষুদ্র পুতুল, খেলনা এবং দেব-দেবীর মূর্তির ঐতিহাসিক বিবর্তন ও শিল্পতাত্ত্বিক গুরুত্ব পর্যালোচনার একটি প্রয়াস। এই প্রবন্ধটিতে ঐতিহ্যের মহান ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নান্দনিক মূল্যবোধ এবং যোগ্যতা রয়েছে। প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনচর্চা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটেছে এই মাটির শিল্পকর্মে। এটি অধ্যয়নে আমি নিশ্চিত যে, পৌরাণিক ইতিহাসের উপর আমার পর্যবেক্ষণ, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে, ঐতিহাসিক ও আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং পালানুক্রমে এই বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এই অধ্যয়নটিকে পদ্ধতিগতভাবে সাজানোর মাধ্যমে প্রকৃত ফলাফল অধ্যয়নে সহায়তা করবে। প্রবন্ধের প্রস্তাবিত বিষয়টি প্রধানত প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যসহ বিশ্ব সভ্যতার অধ্যয়ন যা উপরে উল্লেখিত কাল থেকে এই অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলির মধ্যে পোড়ামাটির লোকশিল্প, আঁকা মৃৎপাত্র, প্রধানত খেলনা, পুতুল, দেবতা অত্যন্ত সমৃদ্ধির ঐতিহ্য বহন করে চলছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি যা এর স্বতন্ত্র প্রভাবের কারণে লক্ষণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, প্রধানত যে সব অঞ্চল প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীন যুগ হিসেবে সর্বাধিক বিস্তৃত মূর্তিগুলো সেসব স্থানে সনাক্ত হয়েছে।

ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ উপমহাদেশের প্রায় সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং স্থানগুলি পোড়ামাটির খেলনা এবং পুতুলের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। পুতুল বাংলাদেশের একটি জীবন্ত ঐতিহ্য। প্রতীকী সেসব ছোট মূর্তি, মানুষের হাতে গড়া প্রথম পুতুল। তাই পুতুল হলো মানুষের হাতে গড়া ক্ষুদ্র মূর্তি যাকে তৈরি করে একদিন আদিম মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূলতা থেকে বাঁচার জন্য পূজা করত, সেই পুতুলের অস্তিত্ব এখন পৃথিবীর সব জায়গাতেই রয়েছে। অনেক গবেষক এটিকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জীবন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হিসেবে দেখেন। মাটির খেলনা, পুতুল ছোট আকৃতির দেব-দেবতার উপর অনুসন্ধান করে দেখেছি, এ বিষয়ে ব্যাপক সমৃদ্ধতা থাকলেও গবেষণা সংগ্রহ তেমন নাই। তাই আমি আশা করি, আমার প্রস্তাবিত প্রবন্ধের বিষয়টি একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। যেহেতু, প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল দেব-দেবতাকে নির্ভর করে। আর তাই মানুষের আকৃতি ছোট ছোট ধর্মীয় দেব-দেবতা, পুতুল ধীরে ধীরে একসময় শিশুদের খেলনায় রূপ নেয়।

একজন গবেষক হিসেবে কেবল তথ্য সংগ্রহে নয়, বরং সেই তথ্যকে ইতিহাসের সূতোয় গেঁথে এমন একটি গভীর জীবনদর্শন তৈরি করার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রযুক্তির সাথে নান্দনিকতার মেলবন্ধন। গবেষণায় মাটির মূর্তির গড়ন, অলঙ্করণ এবং তাতে ব্যবহৃত স্থানীয় উপাদানের শৈল্পিক গুণাবলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে, এই শিল্পধারা কীভাবে সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে এবং আধুনিক মৃৎশিল্পের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, তাই এই আলোচনার মূল লক্ষ্য।

সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন লিখিত ইতিহাস আমাদের নাই। মানব সভ্যতার সূচনা লগ্নের পূর্বের যুগকে আমরা পাগল ঐতিহাসিক যুগ বলি। ঐতিহাসিকরা এই যুগকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তবে সব অঞ্চলে এই যুগ একই সময়ে ঘটে নাই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ঘটে, আর তার প্রধান কারণ ভৌগোলিক অবস্থান। আর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমাদের এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ প্রায় খ্রিস্টপূর্ব আশি হাজার বছর আগে ঘটেছিল। তখন হিমালয়ের পাদদেশে ও এর আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে মানুষের জীবনশৈলীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু তারা কত হাজার বছর আগের তার সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। তবে চীনের জিয়াংসিতে অবস্থিত প্রাচীনতম মৃৎপাত্রটির বয়স প্রায় ১৮ হাজার খ্রিস্টাব্দ। প্রমাণিত, হিমালয়ের ধারায়, গঙ্গার তীর ধরে প্রাচীন সময়ে নদীর অববাহিকাগুলোতে শুরু হয়েছিল মানব সভ্যতার সূচনা। আর নদীর কারণে এই অঞ্চলগুলোতে মাটি ছিল সহজলভ্য। তাই মাটির ব্যবহার ছিল বহুল প্রচলিত। এই অঞ্চলের প্রথম সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা, হিমালয় থেকে আরব সাগর পর্যন্ত প্রায় এক হাজার মাইল বিস্তৃত এই অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগে যার বিকাশ ঘটেছিল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, সিন্ধু উপত্যকা হতে ব্যাবিলনিয়ান, এশিয়ান ও পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে (মুগাল, ২০১৫: ৭৯)।

শত্রুকে তাড়ানো, বুনো জন্তুকে পোষ মানিয়ে আপন করে নেওয়া, প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়া, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ইচ্ছা পূরণ, এই সবকিছু জড়িয়ে আছে আমাদের বড্ড কাছের, পুতুলের মধ্যে। পুতুলের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণে আঁদ্রে মালরোর একটি মন্তব্য বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সরল বাংলায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাক্যটি হলো, “ইমেজ থেকে দৈব কিংবা দেবতা খসে গেলে পুতুল হয়”। একই মাটির তৈরি কিন্তু দেবতা হিসেবে যখন কুমার তৈরি করেন, তখন তার দেখার ভঙ্গি অন্যরকম, যার উৎস বিশ্বাস, আর পুতুল তৈরি করেন জীবিকার জন্য, (‘বাংলার পুতুল’, প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০২১: ডিজিটাল আর্টিকেল ফরমেট: ১.২.১)। প্রাচীন ভারতীয় টেরাকোটার কারিগরি ও শৈল্পিক দিকগুলো তুলে ধরে, এইচ.ডি. সঙ্কালিয়া এবং এম. কে. ধবালিকা বলেছেন যে, “since remotest past man has loved to make figures of clay and the art of clay can be said to be as old as man himself” (১৯৬৯: ৩৩) অর্থাৎ প্রাচীনতম মানুষ মাটির মূর্তি বানাতে পছন্দ করতেন তাই মাটির শিল্পকে সত্যি পুরানো শিল্প বলা যেতে পারে। উত্তর-পশ্চিমে বেলুচিস্তান এবং মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে অসংখ্য মাটির তৈরি পুতুল পাওয়া গেছে। শিহাব শাহরিয়ার লিখেছেন, “হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর মাদার গডেসের সঙ্গে পাঁচমুড়ার মা পুতুল বা ষষ্ঠী পুতুলের মিল পাওয়া যায়” (২০২১: ২৫)।

বিভিন্ন অঞ্চলের পোড়ামাটির পুতুলের গড়নের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন রীতি পরম্পরায় এটি চলে আসছে। পুতুল লোকায়ত বাংলার লোকজীবনের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। পুতুলের জন্ম আদিম গুহা মানবের হাতে (শিহাব, ২০২১: ২৫)। “ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা” বিখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখনীতে উঠে এসেছে, আমাদের জন্মভূমি বসুন্ধরার কথা। আর এই বসুন্ধার মৃত্তিকাকে যারা নিজের মাতৃরূপে পূজা করে চলেছে, সেই সমস্ত শিল্পীর কথা। পুতুল দেবতা বা অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে বেশি পরিচিত বলে উল্লেখ করা হয়। জাদুবিদ্যায় কালো পুতুলগুলোকে জাদুর পুতুল বলে উল্লেখ করা হয়। এই পুতুলগুলো দিয়ে জাদু করা হয় এবং মানুষের নানারকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হানি করার জন্য, পুতুলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হানি করে। এ সকল বিষয়, গ্রামবাংলায় এখনো প্রচলিত আছে। “বিভিন্ন ধর্মের সাথে পুতুল অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছে” (Banglanews 24, senior

correspondent, ২০১৭)। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ও উপ-বস্তুগত সংস্কৃতি এবং শিল্পের পাশাপাশি সমস্ত সময় এবং অভ্যর্থনায় মানুষের সামাজিক জীবনের সন্ধান যা বর্তমান সময় থেকে গৌরবময় অতীতের সমস্ত চূড়ান্ত প্রক্রিয়াকরণে রয়ে গেছে। টিটু সাহার, বাংলাদেশের মাটির পুতুল ও খেলনা, বাংলাদেশ লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশন, ২০২০-এ প্রকাশিত বইটির সাহিত্য পর্যালোচনা করে জানা যায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পুতুল শব্দটির ব্যবহার ছিল না বরং পত্তলিকা বা পৌতলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল দেব-দেবতা নির্ভর করে। আর তাই মানুষের আকৃতির ছোট ছোট এই ধর্মীয় দেব-দেবতা পুতুল ধীরে ধীরে একসময় শিশুদের খেলনায় রূপ নেয়। ‘বঙ্গল’ দেশের একজন সিদ্ধাচার্যের নাম পুতলিপা। তিনি মূর্তি বা পুতুল নিয়ে মধু সংগ্রহ করতেন। আসলে মধুকরির অর্থ ভিক্ষাবৃত্তি। তিনি দেবতার প্রতিকল্প নিয়ে ধর্ম প্রচার ও ভিক্ষা করতেন, অনেকটা পটুয়াদের মত। মনে করা হয় যে, তিনি মূর্তি, পুতুল বা ছবি নির্মাণ করে পরিচিতি পান, তাই হয়তো তার নাম পুতলিপা ছিল। বাংলার ঐতিহ্যবাহী পুতুল, নিয়ে বিখ্যাত লেখকদের লেখা থেকে গুগল যে তথ্য সংগ্রহ করেছে ১২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সেখানে বলা হয়েছে, লোকসাহিত্য চর্চার অন্যতম উপাদান হচ্ছে পুতুল। যখন থেকে মানুষ স্থায়ী বসবাস শুরু করে তখন থেকে পুতুল তৈরি শুরু।

পান্ডু রাজার ডিবি খননের সময় অনেক নিদর্শন মিলেছে, (প্রায় ১২০০ খ্রিস্টাব্দ)। এছাড়া সোমা মুখোপাধ্যায়, তার অনেক বইতে যেমন, ‘বাংলার পুতুল’, ‘বাংলা সংস্কৃতিতে পুতুল’ ও ‘খেলনা, লোকশিল্পের আঙিনায় লোকদেবতা’ প্রভৃতিতে পুতুল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই সাথে বাংলার পুতুলের সাথে দেব দেবতার সম্পর্কগুলো তিনি তুলে ধরেছেন। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পঞ্চ পুতলী’ বইতে পুতুল না থাকলেও পুতুল কেন্দ্রের ভাববোধ প্রকাশ পেয়েছে। পুতুল খেলার সেকাল একাল, অলক ভঞ্জ, সেখানে লিখেছেন, আমাদের সংসারের সাথে পুতুলের সংসার মিলেমিশে গেছে (বাংলা লাইভ.কম, ১৮ জুলাই ২০২৪)। নানা উপাদান ব্যবহার করে যে পুতুল তৈরি করা হয় সে বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। মাটির সঙ্গে মৃৎশিল্পীদের সম্পর্ক অনেকটা মায়ের সঙ্গে সন্তানের নাড়ির টানের মত, যা কখনোই কোনদিন বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তবে বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব যেমন সর্বত্র দেখা গেছে, তেমন মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও তার কোন অন্যথা ঘটেনি। কিশোরগঞ্জের সুনীল পাল ও তার স্ত্রী আজও পুরুষানুক্রমে ঐতিহ্যের এই ধারা এগিয়ে নেওয়ার কাজ করছেন, (উইকিপিডিয়া, ২০১৬)। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প গড়ে উঠেছে বংশপরম্পরায় পূর্বপুরুষদের হাত ধরে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরের মৃৎশিল্প পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম কুটির শিল্প। ১৮৮৮ সালে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের সম্পর্কে ভারতীয় জাদুঘরের সহকারী অবৈক্ষক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা প্রথমে দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং পরবর্তী জীবন্ত আদর্শের পুতুল করার কৌশল করেছিলেন। প্রফুল্ল কুমার সরকার “ভারত বর্ষ” পত্রিকায় “কৃষ্ণনগর রাজপরিবার” নিবন্ধে লিখেছিলেন, “কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের আরম্ভ হয়েছিল কৃষ্ণনগরের রাজার জন্য নর-নারী কুঞ্জর গঠন হতে নয়টি নারী পুতুলের সমষ্টিতে গড়া হয়েছিল এই অদ্ভুত পুতুল। বিখ্যাত শিল্পী জাদুনাথ পালের পূর্বপুরুষ গোপাল পাল এর স্রষ্টা। “ভারতে পোড়া মাটির পুতুল নির্মাণের শিল্পটি অতি পুরাতন” (রফিকুল, ২০০৫: ২০)। মাটির খেলনা পুতুল দেবতা হল একটি দেশের সভ্যতার মাপকাঠি যা প্রাচীনতম নিদর্শন এবং কারুশিল্পের মধ্যে একটি। ১২০০০ বছরেরও বেশি পুরনো, এসব কথা থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে পুতুল, খেলনা, ছোট দেব-দেবীর মূর্তি ও মাটির পাত্র পাওয়া যায়। মাটির পুতুল কিভাবে বানানো হয় এবং এটা কিভাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে, তার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে, ‘মাটির পুতুল’, (অনলাইন, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২১)। গুরুসদয় দত্ত বলেছেন, “The clay dolls of Bengal are not mere playthings;

they are the plastic expression of a race's subconscious aesthetic heritage” (১৯৫৪: ১২-১৩)। তিনি বাংলার পুতুলকে কেবল খেলনা হিসেবে নয় নৃতাত্ত্বিক ও শৈল্পিক দলিল হিসেবে দেখেছেন। গবেষক স্টেলা ক্রামরিশ, তার বিখ্যাত বই, *Unknown Indian: Ritual Art in Tribe and Village* বইটিতে বাংলার পোড়ামাটির শিল্পের আদিম রূপ নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন, “The terracotta figurines of Bengal are a bridge between the Indus Valley Civilization and the living traditions of the rural potter” (১৯৬৮: ৪৪-৪৮)। ডক্টর এ. কে. এম. ইয়াকুব আলীর, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, সুফিয়া খাতুনের, *মধ্যযুগে বাংলার নগরায়ণ*, তোফায়েল আহমেদের *লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত*, আবুল কালাম মোঃ জাকারিয়ার *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* প্রভৃতি বইয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও মৃৎশিল্পের অপূর্ব মহিমার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আছে প্রাচীন সময়ের মৃৎশিল্পের দেব-দেবতার মূর্তি, পুতুল, খেলনার যেমন প্রত্নসম্পদ তেমনি এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। গবেষক বিনয় ঘোষ, বাংলার সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে মৃৎশিল্পের কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব বইটিতে। বাংলার লোকশিল্পের উপর তারাপদ সাঁতারার মাঠ পর্যায়ের কাজ রয়েছে *বাংলার লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ* গ্রন্থে। অশোক মিত্র *The Tribes and Castes of West Bengal* বইটিতে তুলে ধরেছেন, গ্রামীণ মেলা এবং ব্রত-পার্বণের সঙ্গে পোড়ামাটির পুতুলের (যেমন: মা-পুতুল, আল্লাদী পুতুল) আর্থ-সামাজিক যোগসূত্র। লৌকিক ও দৈব, ষষ্ঠী বা মনসা মূর্তির মাধ্যমে যেভাবে বাংলার লৌকিক বিশ্বাস ফুটে উঠেছে, তা কেবল ধর্মীয় নয়, বরং এই অঞ্চলের নারীবাদী চেতনা এবং মাতৃত্বের আদি রূপকেও ধারণ করে।

প্রযুক্তি ও পদ্ধতি

একদিন আদিম মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূলতা থেকে বাঁচার জন্য মূর্তি পূজা করত, সেই মূর্তির অস্তিত্ব এখন পৃথিবীর সব জায়গাতেই রয়েছে পুতুলের মাধ্যমে। বাংলার মৃৎশিল্প কেবল কারিগরি দক্ষতা নয়, বরং এই পলিগঠিত বদ্বীপের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক জীবন্ত ইতিহাস। মাটির সহজলভ্যতা এবং বাঙালি সংস্কৃতির নাড়ির টানে এই শিল্প প্রাচীনকাল থেকেই অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।

কুমার যখন দেবতা তৈরি করেন তখন তার দেখার ভঙ্গিটা হয় বিশ্বাসের। আর পুতুল তৈরি করেন জীবিকার তাগিদে।

বদ্বীপের কাদামাটি এই শিল্পের বড় উপাদান। তাই ‘কুমার’ আলাদা পেশা রূপে বাংলায় গড়ে উঠেছে। মাটির সহজলভ্যতা এবং বাঙালি সংস্কৃতির নাড়ির টানে এই শিল্প প্রাচীনকাল থেকেই অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই অঞ্চলের মানুষ হৃদয় গরিব, কাদা-মাটি তার প্রধান উপাদান। তবে সেই পুরনো দিন থেকে এখন পর্যন্ত মাটির তৈরি পুতুলকে, দেবতা এবং দেবীর প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ঐতিহাসিক সময় থেকেই এটা স্পষ্ট যে, আড়াই হাজার বছর আগে মাটির তৈরি ফলক দৈনন্দিন উপকরণ বা দেবদেবীর মূর্তি ও শিশুদের জন্য খেলনা, পুতুল, এছাড়াও বিভিন্ন পাত্র যা প্রধানত আচার ও সামাজিক কাজে এখনো বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই নান্দনিক দিক থেকেও এটা অসামান্য। বাংলার মৃৎশিল্প দুটি ধারায় স্পষ্ট, একটি হচ্ছে ছাচে ঢালানো সূক্ষ্ম কারু-কার্যমণ্ডিত শিল্প। ছাঁচ দিয়ে বেশি পুতুল তৈরি করা সম্ভব। প্রথমে একখোল, পরে দুখোল ব্যবহার করা হয়।

অন্যটি হচ্ছে হাতের চাপে তৈরি করা আদিম বা ‘প্রিমিটিভ’ আঙ্গিক। কুমাররা যখন আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে যে সকল মূর্তি বা পুতুল গড়ে থাকেন তাকেই আমরা টেপা পুতুল বলে থাকি। টেপা পুতুল বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অনন্য পরিচয় বহন করে। এই আদি রীতিতে ছাঁচ ছাড়াই হাতের চাপে পুতুল তৈরি

করা হতো, যা বাংলার লোকশিল্পের এক প্রাচীনতম রূপ। এইসব টেপা পুতুল রোদে শুকানো বা আগুনে পোড়ানো হয় তবে তা গনগনে আগুনের নয় কম আগুনে পোড়ানো হয়। বিশেষ করে ‘টেপা পুতুল’ থেকে শুরু করে দ্বি-আংশিক ছাঁচ (Double Mould) এবং ‘রিডাকশন’ পদ্ধতিতে কালো রঙের পুতুল তৈরির যে কারিগরি বিবর্তন তা একাধারে সমাজবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অসাধারণ মেলবন্ধন। আদি পর্যায়ের টেপা পুতুলের বিমূর্ত রূপ যে সময়ের সাথে সাথে ছাঁচের মাধ্যমে জ্যামিতিক নিখুঁততায় পৌঁছেছে, তা প্রমাণ করে বাংলার শিল্পীরা কাঠামোগত ভারসাম্যে কতটা দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। মাটি পরিষ্কার করা বা খড়-তুষ মেশানোর মতো প্রাচীন পদ্ধতিগুলো আজও আধুনিক সিরামিকের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ছাঁচের মাধ্যমে ও হাতে টিপে যে সকল পুতুল তৈরি করা হয় সেগুলোকে মিশ্র পদ্ধতি বলে।

বাংলার মৃৎশিল্পের উদ্ভব ও আদি ইতিহাসের প্রধান পর্যায়গুলো আলোচনা করে জানা যায় যে, বাংলার মৃৎশিল্পের ইতিহাস মূলত সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক বা তারও আগের। পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডু রাজ্যের ঢিবি, অজয় নদ উপত্যকা এবং বাংলাদেশের ওয়ারী-বটেশ্বর ও পুন্ড্রনগর (মহাস্থানগড়) থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো প্রমাণ করে, খ্রিস্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর আগেই এখানে উন্নত মানের মৃৎশিল্পের প্রচলন ছিল।

নব্য প্রস্তর যুগ: এই সময়েই মানুষ মাটি পুড়িয়ে পাত্র তৈরি করতে শেখে। প্রথম দিকে হাতের চাপে পাত্র তৈরি হলেও পরে চাকার ব্যবহার শুরু হয়।

তাম্র-প্রস্তর যুগ: এই যুগে বাংলার মৃৎশিল্পে বৈচিত্র্য আসে। লাল ও কালো রঙের মাটির পাত্র (Black and Red Ware) এবং তার ওপর সাদা রঙের নকশা এই সময়ের বৈশিষ্ট্য।

মৌর্য ও গুপ্ত আমলে বাংলার মৃৎশিল্পে এক নতুন ধারার সূচনা ঘটে। এই সময় মাটির পাত্রের পাশাপাশি অলঙ্কার এবং ধর্মীয় মূর্তি তৈরির প্রবণতা বাড়ে। টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলক, এই যুগে স্থাপত্যের গায়ে নকশা করা পোড়ামাটির ফলক ব্যবহারের সূচনা ঘটে। যক্ষ-যক্ষিণী, নারী মূর্তি এবং পশু-পাখির ক্ষুদ্রাকৃতির খেলনা এই সময়ের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। মৌর্য যুগে বাংলা, তথা সমগ্র ভারতের মৃৎশিল্প এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল। এই সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নান্দনিক বোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মূলত মাটির তৈরি ছোট পুতুল, খেলনা এবং দেব-দেবীর মূর্তির মাধ্যমে। মৌর্য যুগের মৃৎশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো দুইভাবে তৈরি করা হতো, হাতে তৈরি আদিম ধারার এই মূর্তিগুলোতে মাটির তালকে হাত দিয়ে টিপে রূপ দেওয়া হতো। ছাঁচে তৈরি মৌর্য যুগে প্রথম দিকে কেবল মুখমণ্ডল তৈরি করে শরীরের বাকি অংশ হাতে গড়া হতো। একে ‘দ্বিমাত্রিক’ শৈলীও বলা হয়। মৌর্যকালীন মূর্তিগুলোতে প্রাচীন লোকধর্মের প্রভাব ছিল স্পষ্ট, সবচেয়ে জনপ্রিয় মূর্তি হলো ‘মাতৃকা দেবী’। এই মূর্তিগুলোকে উর্বরতা এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজো করা হতো। এদের মাথায় বিশাল অলঙ্কার, কানে দুল এবং কোমরবন্ধনী থাকত। ছোট পুতুল, শিশুদের খেলনা ও গৃহসজ্জার উপকরণগুলো ছিল খুবই জনপ্রিয়। পশুপাখির মূর্তি, হাতি, ঘোড়া, ষাঁড় এবং ভেড়ার প্রচুর মাটির খেলনা পাওয়া গেছে। অনেক পশুমূর্তির নিচে ফুটো দেখা যায়, যেখানে চাকা লাগানো হতো যাতে শিশুরা সুতো দিয়ে টেনে খেলতে পারে। বাংলার চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর ২৪ পরগনা), পাণ্ডু রাজ্যের ঢিবি (বর্ধমান) এবং মহাস্থানগড় (বগুড়া) থেকে মৌর্য ও মৌর্য-পরবর্তী যুগের প্রচুর মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলি প্রমাণ করে যে, সেই সময়ে বাংলায় এক উন্নত নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির শিল্প বা টেরাকোটা ছিল এক অনন্য শিল্পকলা। ওই যুগে পোড়ামাটির পুতুল এবং দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে এক অসাধারণ শৈল্পিক পরিপক্বতা লক্ষ করা যায়। গুপ্ত যুগের শিল্পীরাও সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে কাজ করতেন, ছাঁচ বা মোল্ড পদ্ধতি ও হাতে তৈরি পদ্ধতি। পোড়ামাটির খেলনাগুলো ছিল

অত্যন্ত সজীব এবং বৈচিত্র্যময়। এই সময়কার নারী ও পুরুষ পুতুলগুলোর সাজসজ্জা এবং কেশবিন্যাস ছিল অত্যন্ত উন্নত। মূর্তির মুখে এক ধরনের শান্ত ও প্রসন্ন ভাব থাকত। পোড়ামাটির তৈরি ঘোড়া, হাতি, রামছাগল এবং বিভিন্ন ধরনের পাখির মূর্তি খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। চাকা লাগানো ছোট ছোট মাটির গাড়িও এই সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য কুশাণ যুগের তুলনায় গুপ্ত যুগের পুতুলগুলো অনেক বেশি নমনীয় এবং পেশীবহুল গঠনের পরিবর্তে সুডৌল ও কমনীয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড় এবং দক্ষিণবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় থেকে গুপ্ত যুগের শৈলীযুক্ত কিছু টেরাকোটার নিদর্শন মিলেছে।

পাল ও সেন যুগ: স্বর্ণালী অধ্যায় হিসাবে বাংলার মৃৎশিল্পের প্রকৃত বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লক্ষ করা যায় পাল যুগে (৮ম-১২শ শতাব্দী)। এই সময় বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির নির্মাণে ব্যাপকভাবে পোড়ামাটির ব্যবহার শুরু হয়। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও ময়নামতি শালবন বিহারের দেওয়ালে হাজার হাজার পোড়ামাটির ফলক আজও বিদ্যমান। এই ফলকগুলোতে তৎকালীন সমাজজীবন, রামায়ণ-মহাভারত ও জাতকের গল্প বর্ণিত হয়েছে।

দেব-দেবীর মূর্তি, পুতুল ও খেলনার তুলনামূলক আলোচনা: বাংলার পোড়ামাটির শিল্পকলা এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের দুটি প্রধান ধারা শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি খেলনা বা পুতুল এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারায় নির্মিত ধর্মীয় প্রতীক বা বিগ্রহ। যদিও উভয়ই মাটি এবং আগুনের কারুকাজ, তবুও এদের উদ্দেশ্য, নির্মাণশৈলী এবং সামাজিক গুরুত্বের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। এগুলো সাধারণত লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনের অংশ। খেলনাগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিশুদের আনন্দ দেওয়া এবং খেলার ছলে তাদের চারপাশের পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এগুলো সাধারণত লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনের অংশ। শিশুদের কথা মাথায় রেখে এগুলো সাধারণত ছোট আকারের এবং সহজে ধরা যায় এমনভাবে তৈরি করা হয়। এগুলোর কোণগুলো ধারালো হয় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে উজ্জ্বলভাবে রাঙানো হয় যাতে শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খেলনাগুলো দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়, যতক্ষণ না তা ভেঙে যায়। এগুলো ঘরোয়া সাজসজ্জা বা খেলনা হিসেবে বছরের পর বছর থেকে যেতে পারে। এই খেলনাগুলো থেকে শিশুদের কল্পনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায়। টেরাকোটা বা মাটির তৈরি পুতুল বাংলাদেশের আদি শিল্প। যে কারণে বলতে পারি, মাটির পুতুল ও খেলনা বাঙালি লোকশিল্পের এক দারুণ উদাহরণ। পুতুল ও খেলনা তৈরির উপাদান লাগে সামান্য আর তাই এদেশের মৃৎশিল্পীরা মূলত শত শত বছর ধরে মাটির পুতুল তৈরি করে, প্রধানতম লোকশিল্প হিসেবে মানুষের আনন্দ ও চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে নানা ধরনের পুতুল ও খেলনা তৈরি হয়ে থাকে, কারণ ছোট বড় সকলের আনন্দের খোরাক যোগায় এই পুতুল। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে শিশুতোষ খেলনা ধর্মীয় প্রতীকী আবেদনময় নিখাদ আনন্দের ও শৈশব স্মৃতি বিজড়িত।

দেব-দেবীর ধর্মীয় প্রতীক, এগুলো নির্মিত হয় উপাসনা, মানত বা বিশেষ ধর্মীয় আচারের জন্য, সাথে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাস জড়িত থাকে। বিগ্রহ বা প্রতীকের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় নিয়ম বা প্রথা মেনে চলা হয়। এগুলোতে অলঙ্করণ থাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গাভীরূপ। অনেক সময় অলঙ্করণের মাধ্যমে দেবত্বের মহিমা প্রকাশ করা হয়। অনেক ধর্মীয় পোড়ামাটির শিল্প (যেমন: ঘট বা পূজার পুতুল) নির্দিষ্ট তিথি বা পূজার পর বিসর্জন দেওয়া হয় কিংবা পবিত্র স্থানে রেখে আসা হয়। এগুলোর ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে সমসাময়িক ও আনুষ্ঠানিকতা যা ঐতিহ্য ও ধর্মীয় উত্তরাধিকার বহন করে। এগুলো গ্রামীণ মেলা ও লোকজ বাজারে সহজলভ্য এবং মন্দির সংলগ্ন এলাকা বা বিশেষ তিথিতে পাওয়া যায়।



গুপ্ত যুগে সমৃদ্ধশালী মৃৎশিল্পের মাতৃকা মূর্তি বা ছোট আকৃতির মা দেবতা, খেলনা রূপে বা গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত হয়।



মা মূর্তির আদলে তৈরি, কলসি কাঁখে নারী মূর্তি, যুগের পর যুগ গ্রাম বাংলার অপরিপক্ব দৃশ্য হিসাবে এই মূর্তিগুলোকে তৈরি করা হয়।
এই মূর্তিগুলি ছাঁচে তৈরি এবং রং ব্যবহৃত।



দেবী সদৃশ ছোট আকৃতির নারী মূর্তি, সিন্ধু সভ্যতায় প্রচলিত।



প্রাচীন সময় থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত ছোট আকৃতির দেবী মূর্তি।



গ্রাম বাংলার বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রতিকৃতি এবং পশুপাখির মূর্তি। এগুলো ছাঁচে তৈরি করা ও রং ব্যবহৃত হয়।



বিনোদন পেশায় যুক্ত প্রাচীন সময় থেকে ছোট আকৃতির মূর্তিগুলো সব যুগে সব অঞ্চলেই পাওয়া যেত।



সিল্কু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত ছোট আকৃতির চাকায় টানা গাড়ি, খেলনা ও বাঁশি।



দেবতা ও পবিত্রতার প্রতীক, গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত এবং খেলনা হিসাবে বাচ্চাদের বিনোদন যোগায় এই গরু মূর্তি।
যা আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রচলিত।



টেপা পুতুল: হাতে টিপে তৈরি, সিল্কু সভ্যতা থেকে আবিষ্কৃত নারী ট্যাঁপা পুতুল।



টেপা পুতুল: কিস্তি গুপ্ত যুগের অলংকরণ, নারী মূর্তির উদাহরণ হিসেবে, হাতের তৈরি এই মূর্তিগুলো এখনো প্রচলিত।



বাচ্চাদের জনপ্রিয় খেলনা সামগ্রী হাতে তৈরি অলংকরণযুক্ত হাতি, যা মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন যুগেও প্রাপ্ত। যা ঘরের সজ্জা ও বাচ্চাদের খেলনা রূপে ব্যবহৃত হয়।



হাতে তৈরি, বাচ্চাদের জনপ্রিয় খেলনা-মূর্তি, ঘোড়ার পিঠে মানুষ।



টেপা পুতুল: গ্রাম বাংলার মহিলাদের অবসরের দৃশ্য।



ছাঁচে তৈরি বিভিন্ন দেবদেবতার ছোট আকৃতি মূর্তি।

ফলাফল বিশ্লেষণ: গবেষণালব্ধ তথ্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফলাফলগুলো পরিলক্ষিত হয়: বাংলার মৃৎশিল্প কেবল শৈল্পিক চর্চা নয়, বরং এটি ৫০০০ বছরের পুরনো সিন্ধু সভ্যতার একটি ধারাবাহিক রূপ। মহাস্থানগড় ও চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন প্রমাণ করে যে, প্রাচীন মেহেরগড় বা সিন্ধু সভ্যতার মাটির পুতুলের নির্মাণশৈলীর (যেমন: টেপা পুতুল পদ্ধতি) সাথে বাংলার লোকজ পুতুলের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। বিবর্তন ও ধারাবাহিকতা ধর্মীয় ও জাদু-বিশ্বাসের রূপান্তর এই শিল্পে প্রাগৈতিহাসিক যুগে উর্বরতা শক্তির প্রতীক হিসেবে যে ‘মাতৃকা মূর্তি’ (Mother Goddess) তৈরি হতো, তা কালক্রমে পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মূর্তিগুলো উর্বরতা ও সৃজনী শক্তির ধারক হিসেবে প্রমাণিত। পুতুল বা মৃৎ মূর্তিগুলো মূলত মানুষের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও ভীতি দূর করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। বাংলার মৃৎশিল্পীরা স্থানীয় পলিমাটি ব্যবহার করে হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় (Manual modeling) যে প্রাণবন্ত রূপ দান করেছেন, তা বিশ্ব ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসে অনন্য। প্রাচীন পোড়ামাটির শিল্পে কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই হাতের স্পর্শে এবং সাধারণ খোদাই পদ্ধতিতে যে রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা অনন্য। দেবদেবীর মূর্তিতে একদিকে যেমন ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে পুতুল ও খেলনায় ফুটে উঠেছে গ্রামীণ মানুষের সরল জীবনের প্রতিফলন। পুতুলের গড়নে জ্যামিতিক নকশা এবং বলিষ্ঠ অবয়ব এর প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বকে প্রমাণ করে। মৃৎশিল্পের এই নিদর্শনাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তৎকালীন সমাজে সাধারণ মানুষের জীবনের ছোট ছোট আনন্দ-বেদনা, শিশু, বিবাহ-পরবর্তী দৃশ্য বা পালকি চড়ার দৃশ্যগুলো পোড়ামাটির ফলকে প্রাধান্য পেয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, এই শিল্প ছিল সাধারণ জনগণের শিল্প (Folk Art), যা রাজকীয় আভিজাত্যের চেয়ে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের জীবনকেই বেশি ধারণ করত। মহাস্থানগড়, ময়নামতী ও পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষে পাওয়া এসব নিদর্শন থেকে সেই সময়ের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং মাটির সহজলভ্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি নির্দেশ করে যে, পাল ও সেন যুগে মৃৎশিল্প উন্নতির এক চরম শিখরে পৌঁছেছিল এবং তা কেবল ধর্মীয় কাজেই নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন বিনোদন ও গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। বাংলাদেশের প্রাচীন মৃৎশিল্প তথা টেরাকোটা আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষ করে পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি এবং ঘর সাজানোর বা খেলার সামগ্রীগুলো শুধুমাত্র মাটির তৈরি বস্তু নয়, বরং এগুলো প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শৈল্পিক চেতনার জীবন্ত দলিল।

উপসংহার: কুম্ভকাররা যখন একই মাটি দিয়ে একদিকে শিশুর হাসির খোরাক জোগায়, অন্যদিকে তৈরি

করে ভক্তের আরাধ্য দেবতা, তখন তা কেবল একটি মাটির পুতুল থাকে না; বরং হয়ে ওঠে বাংলার শেকড় সন্ধানী সংস্কৃতির এক অনন্য নিদর্শন। বাংলার পোড়ামাটির এই দুই ধারার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এরা একে অপরের পরিপূরক। উন্মুক্ত দহন থেকে ‘পয়া’ বা বিশেষ চুল্লির ব্যবহার আমাদের পূর্বপুরুষদের তাপগতিবিদ্যা সংক্রান্ত সহজাত জ্ঞানের পরিচয় দেয়। বিশেষ করে চন্দ্রকেতুগড় বা পাণ্ডু রাজার টিবির উদাহরণগুলো এক অনন্য ঐতিহাসিক গভীরতার পরিচায়ক। এই গবেষণায় দেখা গেছে, ধর্ম এবং শিল্পের মিলনস্থল হলো এই মৃৎমূর্তিগুলো। যা একসময় আদিম মানুষের ভয়-ভীতি বা জাদু-বিশ্বাসের অনুষ্ঙ্গ ছিল, আজ তা আমাদের ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ স্মারক। যদিও আধুনিক প্লাস্টিক বা যান্ত্রিক খেলনার ভিড়ে এই আদিম মৃৎশিল্প আজ অস্তিত্ব সংকটে, তবুও এর নান্দনিক মূল্য অপরিসীম এবং এর আবেদন আজও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আমাদের এই অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে হলে এই মৃৎশিল্পীদের মূল্যায়ন এবং ঐতিহ্যবাহী নকশাগুলোকে আধুনিক আঙ্গিকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। পোড়ামাটির এই পুতুল ও মূর্তিগুলো আমাদের মাটির সাথে শিকড়ের সম্পর্কেরই চিরন্তন প্রতীক। সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রাচীন লোকশিল্পকে টিকিয়ে রাখা কেবল শিল্পের খাতিরে নয়, বরং আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসকে জীবন্ত রাখার স্বার্থেই অপরিহার্য।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রাচীন মৃৎশিল্পের এই পোড়ামাটির ফলক, পুতুল এবং দেবদেবীর মূর্তিসমূহ কেবল একটি মৃৎশিল্প নয়, বরং আমাদের হাজার বছরের পরিচয়ের ধারক। এই শিল্প প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিল্পের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম যা, পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা এবং বিশ্বাসকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে মূর্ত করে তোলে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৬), ক্ষীরের পুতুল, আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস, কলকাতা।
২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৭), ভারত শিল্পে মূর্তি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।
৩. অশোক মিত্র (১৯৫৩), *The Tribes and Castes of West Bengal*, Land and Land Revenue Department, Government of West Bengal।
৪. আবুল কালাম মোঃ জাকারিয়া (ডিসেম্বর, ১৯৮৪), *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।
৫. ইবনে গোলাম সামাদ (২০০৬, জুন), *মানুষ ও তার শিল্পকলা*, অগ্রগামী প্রিন্টার্স, আরামবাগ, ঢাকা।
৬. এইচ.ডি. সঙ্কালিয়া এবং এম. কে: ধবালিকা (১লা ডিসেম্বর ১৯৬৯), *The Terracotta Art of India*, ‘মার্গ’ (Marg), ভলিউম-২৩ (সংখ্যা-১) সম্পাদক: মূলকরাজ আনন্দ।
৭. ওয়াকিল আহমেদ (জুন ১৯৯৯), *লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৮. গুরুসদয় দত্ত (১৯৫৪), *The Folk Art of Bengal*, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা।
৯. জন কেই (২০০০), *ইন্ডিয়া*, হারপের প্রেস, লন্ডন।
১০. টিটু সাহা (২০২০), *বাংলাদেশের মাটির পুতুল ও খেলনা*, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁ।
১১. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী (২০০১), *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, এস নাহার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

১২. ড. রফিকুল আলম (২০০৫, অক্টোবর), *বিশ্ব সভ্যতা ও শিল্পকলা*, বাংলা একাডেমি, বাংলা বাজার, ঢাকা।
১৩. ড. শাহরিয়ার তালুকদার (২০০১, জুন), *Folk Art of Bangladesh Through Ethno- Archological Perspective*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
১৪. তারাপদ সাঁতরা (২০০০), *বাংলার লোক শিল্প ও শিল্পী সমাজ*, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
১৫. তোফায়েল আহমেদ (১৯৯৯, মে), *লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
১৬. বিনয় ঘোষ (২০০৫ পুনর্মুদ্রণ), *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।
১৭. মনীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত (১৯৯৫), *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
১৮. মৃণাল ঘোষ (২০১৫), *রূপরেখা*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা।
১৯. সুফিয়া খাতুন (২০১৫ নভেম্বর), *মধ্যযুগে বাংলার নগরায়ণ*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
২০. স্বপন কুমার ঠাকুর (২০২৫, জানুয়ারি), *লুপ্ত দেবতা বিলুপ্ত উৎসব*, দীপ প্রকাশনা, কলকাতা।
২১. স্টেলা ক্রামরিশ (১৯৬৮), *Unknown Indian: Ritual Art in Tribe and Village*, philadelphia Museum of Art।
২২. Joyce Burkhalter Flueckiger (2015), *Everyday Hinduism*, John Wiley & Sons, UK, ISBN-781118528204.

প্রবন্ধপঞ্জি

১. অলোক ভঞ্জ (১৮ জুলাই ২০২৪), ‘পুতুল খেলার সেকাল একাল’, আর্টিকেল, বাংলা লাইভ.কম।
২. আবুল মনসুর (১৩ মে ২০১৭), ‘মূর্তি ও ভাস্কর্য বিষয়ক বিড়ম্বনা’, prothom alo. com।
৩. প্রথম আলো (২০২৪), ‘গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী মাটির পুতুল’, ডাব্লিউ ডাব্লিউ. প্রথম আলো. কম।
৪. শিহাব শাহরিয়ার (১০ জানুয়ারি ২০২১), ‘পুতুল: লোকায়ত বাংলার মূল্যবান শিল্প’, রাইজিং bd.com.
৫. সিনিয়র কorespondেন্ট (২ জুন ২০১৭), ‘হারিয়ে যাওয়া মাটির পুতুল’, banglanews 24।
৬. সোমা মুখোপাধ্যায় (১২ এপ্রিল ২০২৪), ‘বাংলার পুতুল’, বাংলা লাইভ.কম।